প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য

পটুয়া এবং সময়

চোদ্দই জুন (১৯৭০) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে পটুয়া-সংগীত সহ পটের ছবির যে-প্রদর্শনীর উদ্বোধন হল, তার জন্যে কর্মকর্তাদের প্রচুর মধু-র সঙ্গে কিঞ্চিৎ হুলও প্রাপ্য। উদ্যোক্তাগণ প্রশংসাভাজন এইজন্যে যে নাগরিক সমাজের ঠিক নজরের সামনে পটুয়াদের কাজ জাঁকিয়ে হাজির করার দিক দিয়ে সাম্প্রতিক কালে এইটে নিশ্চয় এক মস্ত পদক্ষেপ। সত্যিই, এরকম অসাধারণ সাংস্কৃতিক ভোজ কলকাতায় কালেভদ্রে জোটে। কলকাতার সংস্কৃতির ঠিকাদারদের কল্যাণে এগজিবিশনে বা 'বিচিত্রানুষ্ঠানে' খাড়া-বড়ি-থোড় থোড়-বড়ি-খাড়ার বারমেসে ব্যঞ্জন খেতে-খেতে যখন আমাদের অরুচি ধরার জোগাড়, তখন জোরালো, স্পষ্ট ছাঁদের প্রায় ষাটখানা জ্বলজ্বলে পটের সামনে গিয়ে দাঁড়ানো আর সেই সঙ্গে আমদাবাদ গ্রামের তিনজন পটুয়ার গান শুনতে পাওয়া—নিশ্চয়ই একটা উপাদেয় অভিজ্ঞতা; এবং দুর্লভও। যত দূর জানি, কলকাতায় এরকম অনুষ্ঠান এর আগে আর একবারমাত্র হয়েছিল, তা-ও বহু বছর আগে, ১৯৩২ সালের মার্চ মাসে। তার আয়োজন করেছিলেন গুরুসদয় দত্ত মশাই। তিনি দাবি করে গেছেন, ভারতবর্ষে সেটাই 'গণ-শিল্প-প্রদর্শনী'র প্রথম অনুষ্ঠান।

পরিষদের এই প্রদর্শনীতে খুঁত ছিল বিস্তর। প্রথমতঃ, পূর্ণাঙ্গ প্রদর্শনী একে বলা কঠিন। কারণ, চৌকো পট, বিশেষতঃ কালীঘাটের পট, ঠাঁই পায় নি এখানে। কর্মকর্তারা অবশ্য বলছেন, ওঁরা শুধুই জড়ানো পটের প্রদর্শনী করেছেন। তাহলে প্রশ্ন ওঠে: জাদুপট দেখানো হল কেন? জাদুপটের সঙ্গে তো সাধারণ জড়ানো পটের আকাশ-পাতাল তফাৎ। পট হিশেবে, আর ব্যবহারের দিক দিয়ে তো বটেই, সমাজতাত্ত্বিক স্তরের বিচারেও জাদুপটের সঙ্গে কোনও মিল নেই জড়ানো পটের। জাদুপটুয়ারা হল আদিবাসী বা উপজাতীয় শিল্পী। আর যারা জড়ানো পট লেখে (পটুয়াসমাজে 'পট আঁকা' নয়, 'পট লেখা' কথাটাই চালু), তাঁদের একাংশ আজ 'সামাজিক' শ্রেণীভুক্ত; জাতিতে চিত্রকর। ছুতোর কামার তাঁতি কুমোর ইত্যাদি নয়টি কারুজীবী জাতির মধ্যে চিত্রকরদের স্থান। অর্থাৎ নীচের তলায় হলেও, বর্ণসমাজের কিঞ্চিৎ স্বীকৃতি এরা পেয়েছে, যা জাদুপটুয়াদের কপালে জোটে নি। হয়তো, অনেকটা এরই দরুন, জড়ানো পটের থেকে জাদুপটের মেজাজটাই আলাদা হয়ে গেছে। জাদুপটে পড়েছে অনাত্মীয়ের নির্মোহ, ঈষৎ তির্যক দৃষ্টির ছাপ।

দ্বিতীয়তঃ, যেভাবে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এর প্রদর্শনীতে ছবি সাজায়, সেইভাবেই আধ-খোলা পটগুলোকে টাঙিয়েছিলেন কর্মকর্তারা। জড়ানো পট তো ফ্রেমে-বাঁধা ছবি নয়। তাই ওভাবে পট দেখালে, অনেক কিছুই দেখানো হয় না। তাছাড়া, পটুয়া-সংগীত শোনা গেল শুধু প্রথম দিন। পটুয়া ছবির সঙ্গে রোজ পটুয়া-গান শোনানোর ব্যবস্থা না-করলে (টেপ রেকর্ডে হোক, বা অন্যভাবে হোক) রীতিমত অঙ্গহানি ঘটে অনুষ্ঠানের।

তবে এসব খুঁতের জন্যেই কর্তৃপক্ষের নিন্দে করছি না। নিন্দে করছি, মান-বিভ্রমের জন্যে। উদ্বোধনের দিন প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেছিলেন একজন ধনী কাগজওয়ালা আর সভাপতির সিংহাসনে বসেছিলেন জনৈক আমলা, খুবই নৈকষ্য কুলীন। প্রধান অতিথি মশাই এক-গঙ্গা আবোলতাবোল অনেকক্ষণ ধরে বকে গেলেন আর মাঝে-মাঝে হেঁকে উঠতে লাগলেন : 'আমি পট সম্বন্ধে কিচ্ছু জানি নে। জানি নে বলেই এসব অবান্তর কথা বলছি।' কোনো সারস্বত প্রতিষ্ঠানে আকাট মূর্খতা এমন নিরেট দম্ভের সঙ্গে জাহির করা যায়, তা এর আগে কোথাও দেখি নি। আমদাবাদ গাঁ থেকে যে তিনজন পটুয়া সেদিন এসেছিলেন,— সেই তাঁদের কলকাতার সঙ্গে প্রথম পরিচয়— কী ভাবছিলেন তাঁরা এই বোম্বাগড়ের রঙ্গ দেখে? হয়তো এ ওর দিকে তাকিয়ে বিমূঢ় মনে ভাবছিলেন, 'ভাই, একেই কি মেলা কয়? বাবুদের মেলা?'

দর্শনধারী মহোদয়দের দোষ দিয়ে লাভ কী? কে ওঁদের আসন দিলে সুনীতি চাটুজ্জে মশাইয়ের পাশে? কে দিলে শিরোপা?

আমার অভিযোগ এই : ধনপতি আর আমলাদের সংস্কৃতির মাস্তান বানিয়ে কর্তৃপক্ষ সাহিত্য-পরিষদের ইতিহাসকেই প্রত্যাহত করে নিলেন। পরিষদের উঠতি কর্তারা সম্ভবতঃ ভুলে গেছেন, শোভাবাজার রাজবাড়ির আওতা থেকে বার করে এনে 'সাধারণ প্রকাশ্য স্থানে' পরিষদের দপ্তর স্থাপন করার জন্যে কী প্রচণ্ড লড়াই হয়েছিল ১৩০৬ সালে। কারা ছিলেন সেই লড়াইয়ে প্রথম সারির নেতা? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রমুখ এগারো জন মনীষী। একটা পাঁবত্র কিংবদন্তি আছে এ-নিয়ে। ১৩০৬ সালের ৪ ফাল্গুন, যেদিন পরিষদ-কার্যালয় কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের ভাড়াটে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়, সেদিন নাকি লাইব্রেরির বই মাথায় করে বয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং!* চোদ্দই জুন দেখলুম, সেই ইতিহাসের উল্টো মুখে কেঁচে গণ্ডুষ গীত!

পটের ছবির পক্ষে দুটো দাবি পেশ করেছিলেন গুরুসদয় দত্ত। প্রথমতঃ, পট

---

* এই কিংবদন্তি যে নিতান্তই অমূলক নয়, তার কিছু সমর্থন পাই রবীন্দ্রনাথ-রামানন্দ পত্রাবলিতে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১৯৪১ সালের ১৩ মে তারিখে রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন : 'পরিষৎকে রাজা বিনয়কৃষ্ণর বাড়ী হইতে সাধারণ স্থানে আনিবার নিমিত্ত আপনি সকলের চেয়ে বেশি পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ইহা আপনার মুখে শুনিয়াছি।'

হচ্ছে প্রাক্-বৌদ্ধ চিত্রকলার 'অবিরল-প্রবাহিত, অভ্রষ্ট ও অবিচ্ছিন্ন পরম্পরাগত' রূপ। দ্বিতীয়তঃ, 'জগতের চিত্রশিল্পের আসরে' বাঙলা দেশের পট নিঃসন্দেহে 'একটা শ্রেষ্ঠ আসন' পাবে। প্রাক্-বৌদ্ধ যুগের বলছেন কেন? হয়তো এই কারণে যে কোনো-কোনো ভারততত্ত্ববিদ মনে করেন, আজীবিক সন্ন্যাসী গোসাল মংখলিপুত্ত পুবাশ্রমে ছিলেন পটুয়ার ছেলে। কথাটা তো ঠিকই, হালে ক্ষীণ হয়ে এলেও, পটের ছবির ধারাবাহিক ঐতিহ্যে কোনও দিনই ছেদ পড়ে নি। অনেক ছোটোখাটো ব্যাপারের মধ্যেও তার প্রমাণ আছে। যেমন কুমারস্বামী লিখেছেন, অজন্তার শিল্পীরা রঙ গুলতেন নারকোল-মালায়। পটুয়ারা নারকোলের মালাতেই রঙ গোলেন এখনও। পুরোনো সাহিত্যে সেকালের পটুয়াদের যে-সব বর্ণনা পাওয়া যায়, তার সঙ্গে মিল আছে আজকের পটুয়াদেরও। উদাহরণ হিশেবে সপ্তম শতাব্দীর গদ্যকাব্য 'হর্ষচরিত' থেকে এই বিবরণটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

> 'বিপণি-বীথিতে প্রবেশ করলেন হর্ষদেব। তাঁর চোখে পড়ল—যমপট দেখিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এক যম-পটিক।
>
> তার ডান হাতে প্রকাণ্ড শর,
>
> আর বাম হাতে,— ভীষণ মহিষে-চড়া প্রেতনাথের এক চিত্তির-বিচিত্তির ছবি। নগরের পথের বালকেরা চীৎকার করছে— "কি হয়েছে, কি হয়েছে?" দেখছে, আর ভীড় ক'রে সঙ্গে ছুটছে। যখন শ্রীহর্ষ তাঁর তুরঙ্গ-সৈন্য নিয়ে যমপটিককে পিছনে রেখে চ'লে গেলেন, তখন সে ছড়া আওড়াচ্ছে—
>
> "হাজার হাজার মা আছে, হাজার
> হাজার বাপ আছে ; ওরে,
> ছেলেও আছে ; ওরে, স্ত্রীও
> আছে। যুগের পর যুগ চ'লে
> যাচ্ছে, তুই কে, ওরা তোর কে?" '
>
> 'হর্ষচরিত', প্রবোধেন্দু ঠাকুর -অনূদিত

এখনও প্রায় এইভাবেই ছবি দেখায় পটুয়ারা। আর যমরাজের ছবি? তা-ও থাকে বীরভূমের পটের শেষ অংশে।

ঐতিহ্যের মূল্য ব্যবহারে। পটুয়াদের ঐতিহ্য যে কী দীপ্যমান চিত্রকলার জন্ম দিতে পারে, যামিনী রায়ের ছবিই তার অকাট্য প্রমাণ। ভবিষ্যতের কোনো শিল্পী যদি দেশজ ঐতিহ্যের জমির ওপর দাঁড়িয়ে নতুন চিত্রকলার সিংহদ্বার খুলতে চান, পটুয়াদের ছবি তাঁর হাতে চাবিকাঠির কাজ করবে।

শুধু ছবির রাজ্যেই কেন, শিল্পকলার আরও বহুতর ক্ষেত্রেও নতুন-নতুন প্রবর্তনা

জোগাতে পারে পটুয়াদের কাজ।

এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে বেশি করে মনে হয় সিনেমার কথা। সিনেমার সঙ্গে আংশিক মিল-ও আছে জড়ানো পটের। দীর্ঘ পটে পর-পর বিন্যস্ত ছবিগুলো খুলে-খুলে দেখানো হয় ক্রমশঃ। এতে থেকে-থেকে এক ধরণের গতির দোলা লাগে ছবিতে, ছবি হয়ে ওঠে চলচ্ছবি, আর তার সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে গানের-বাহনে-চড়া গল্প। আমার তো মনে হয়, জড়ানো পটের চলচ্চিত্রায়ণ সম্ভব! শুধু তা-ই নয়, জড়ানো পট থেকে নানান উপাদান নিয়ে রূপকল্পের পরীক্ষা করা যায় চলচ্চিত্রের জমিতে। ভাবতে অবাক লাগে চলচ্চিত্রের বাইরে থেকে, চৈনিক বা জাপানি চিত্রলিপি থেকে আইজেনস্টাইন মন্তাজ আবিষ্কার করেছিলেন। এই আবিষ্কারের পর সিনেমা পেল শিল্পের মহিমা, পালটে গেল তার ইতিহাস। আবার, মায়াকভস্কির কবিতার নানান মাপের ভাঙা-ভাঙা প্রবহমান লাইনেও সিনেমার ছন্দের প্রতিসাম্য পেয়েছিলেন আইজেনস্টাইন। পটুয়াও কাজে লাগান, অনেকটা মায়াকভস্কির রীতি, বা সিনেমার লং শট, ক্লোজ-আপ -এর মতন কৌশল। তাঁকেও ব্যবহার করতে হয় কাট্-এর রকম-ফের। পটুয়ারা যেভাবে গল্পের খেই টেনে যান, বা যেভাবে শুদ্ধ ডিজাইনের ঈষৎ চলন্ত আলপনা গেঁথে-গেঁথে নেন গান-গল্পের সুতো দিয়ে, তা বাস্তবিক লক্ষ করবার জিনিশ। আমাদের দেশ এখনও প্রতীক্ষায় রয়েছে কোনো অনাগত আইজেনস্টাইনের, যিনি জড়ানো পট থেকে যা-কিছু নেবার, তা ছেঁকে নিয়ে দুঃসাহসিক প্রয়োগে ফলবান করবেন চলচ্চিত্রের কলাবিধি। সিনেমার দেশজ শিল্পরূপ স্পষ্ট চেহারা পাবে সেদিন।

চীনের স্ক্রল বা জাপানি মাকিমোনো-ও জড়ানো ছবি। কিন্তু পটের মতন গানের সঙ্গে তার যোগ নেই। আসলে, গানেতে-ছবিতে মেশানো যৌগিক শিল্পরূপ হিশেবে জড়ানো পটের নিজস্ব মূল্যও অনেক। কারণ, ছবির আশ্রয় দেশ ; আর গান কালে আশ্লিষ্ট ; জড়ানো পট যুগপৎ এই দুই পৃথক মাত্রাকে ছুঁয়ে থাকে। এই বিশেষত্বকে রবীন্দ্রনাথের একটি বীজগর্ভ উক্তির পাশাপাশি রাখলে বুঝতে পারব বাঙলাদেশী পটের সম্ভাবনা : 'কালের বা দেশের মাত্রা বদল করবা-মাত্রই সৃষ্টির রূপ এবং ভাব বদল হয়ে যায়।'

কালের মাত্রার সূত্রে মনে পড়ল, গুরুসদয় দত্ত তাঁর একটা ইংরেজি প্রবন্ধে লিখেছেন, সময়কে পটুয়ারা পরিহার করেছেন। হাইন্‌রিশ ৎসিমার তো বলেছেন, তামাম ভারত-শিল্পেই কালের মাত্রা বর্জিত। এ-সব কথা আমার কাছে গ্রাহ্য ঠেকে না। পটের ছবির প্রসঙ্গে তো নয়ই। তার একটা সোজা কারণ এই : পটের সঙ্গে গানের যোগ অচ্ছেদ্য ; আর গান কালমাত্রিক। এ ছাড়া অন্য যুক্তিও আছে। টানা একটা গল্প বলে যায় পটুয়ার এই ছবি-আর-গান। গল্প এলেই, কাল আসে। পৃথিবীর সব গল্পই তো সারি-সারি 'তারপর'-এর অনুক্রম দিয়ে গাঁথা। অতএব পটুয়া মোটেই নিঃসময়ের কারবারি নয় ; সময় নিয়েই তার কারবার। তবে আর্টের লজিকে ব্যবহারিক কালকে ভণ্ডুল করে

দিয়ে, নতুন রসায়নে সময়ের নবীন ছন্দ বানায় সে, পালটে দেয় কালের মাত্রা।

কথাটা স্পষ্ট করে বলি। দৃষ্টান্ত হিশেবে, পরিষদের প্রদর্শনীতে দেখানো মেদিনীপুর জেলার দুটো পটের উল্লেখ করা যেতে পারে। আঁকার রীতি দেখে মনে হয়, শিল্পীদের ঘরানা অভিন্ন। পটদুটোর থীমও এক : জটায়ু-রাবণের লড়াই। একটা পট সেকেলে ; অন্যটা হালের ; কিন্তু সময়কে ব্যবহার করার রেওয়াজটা একই রকম। আপাততঃ মনে হবে, কালের ঐক্য উপেক্ষা করেছেন শিল্পীরা। পুরোনো পটটিতে একই-বর্ডারে-ঘেরা জমিতে দেখানো হয়েছে : ১. জটায়ু রাবণের রথ গ্রাস করতে উদ্যত ২. পঞ্চবটী বনের শূন্য কুটিরে রাম-লক্ষ্মণ দাঁড়িয়ে, সীতা নেই ৩. আর তার পাশেই, জটায়ু রামকে সীতাহরণের খবর দিচ্ছে। আসলে, এই ঘটনা তিনটে তো ঘটেছিল ভিন্ন-ভিন্ন সময়ে ; পটে কিন্তু ওদের বাঁধা হল একই ছবির আবেষ্টনে, ঈষৎ-প্রসারিত একই কালের পর্দায়।

বীরেন চিত্রকরের আঁকা ঐ নতুন পটটিতে দেখি একই পদ্ধতি। তফাৎ শুধু এই : রামের সঙ্গে কথা বলার সময়ে জটায়ুর মুখটা অন্য দিকে ঘুরে গেছে।

আসলে কালের মাত্রার এই হেরফের ঘটানো চিরকেলে শিল্পীর স্বধর্ম। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে ভারহুতের ভাস্করও পাথরের গায়ে কুরঙ্গ-মৃগ জাতক উৎকীর্ণ করতে গিয়ে একইভাবে সময়কে ইলাস্টিকের ফিতের মতন খেলিয়েছিলেন। আবার খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে সময়কে একইভাবে খেলিয়েছেন অমরাবতীর সেই শিল্পী যিনি পাথরফলকে খোদাই করেছেন গৌতম বুদ্ধের নালাগিরি-দমনের বৃত্তান্ত। খুবই চেনা গল্প। বুদ্ধকে পিষে মারার জন্যে দেবদত্ত এক মাতাল হাতি— নালাগিরিকে— লেলিয়ে দিয়েছিলেন। বুদ্ধ সেই খুনে হাতিকে বশ করেন অলৌকিক করুণায়। কালের সংস্করণকে এই ভাস্কর উৎকীর্ণ করেছেন নালাগিরির মূর্তিতে। দুই পৃথক ক্ষণকে কাঁদে দেখাবার জন্যে ওই হাতিকে আনছেন দুবার। সময়ের এই দুই পৃথক ক্ষণের মধ্যে রয়ে গেছে রুদ্ধশ্বাস কয়েক মুহূর্তের ব্যবধান : হাতির ঐ দুটো মূর্তির মধ্যবিন্দুতে যেন খোদাই হয়ে আছে একটি অনুচ্চার 'তারপর'। এই পাথরচিত্রকে, মনে মনে, ঠিক মাঝ বরাবর একটি খাজু রেখায় দুখণ্ড করা যায়। যার এক পাশে দেখি : বুদ্ধকে সংহার করতে নালাগিরি ধাবমান ; এক উদ্দাম গতি, এক মাথিত সময়, উত্তাল হয়ে উঠল এই মত্ত হাতির শরীরে। অন্য পাশে দেখছি : বুদ্ধের পায়ের তলায় শমিত, প্রণত নালাগিরি। তখন পালটে গেছে কালাঙ্ক, বদলে গেছে সময়ের চলন। বাঁ দিকে দেখছি, কালের রুদ্র রূপ ; ডান দিকে, তার শান্তকরুণ মূর্তি।

দুই

সময়কে পটুয়া খেলিয়েছে ঠিকই ; কিন্তু সে নিজে সময়ের হাতে মার খেয়েছে,

মর্মান্তিক মার। কমিউনিটি বা কৌম হিশেবে পটুয়ার আজ নাভিশ্বাস উঠেছে। ওর বেঁচে বর্তে থাকার সমস্যা একালে হয়তো চরম দশায় পৌঁচেছে; কিন্তু এই ধ্বংসের শুরু কি আজ? বিনয় ঘোষের হিশেব মতো 'ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বছরে পটাশিল্পের ক্ষয় শুরু হয়েছিল।' এভাবে ঠিক সন-তারিখ বলা শক্ত; তবে সন্দেহ নেই, ইংরেজ আমলে উপনিবেশের অর্থনীতি আর নতুন ভূমিব্যবস্থার আঘাতে গ্রামীণ কৌমের বিপর্যয় যখন শুরু হল, তখন থেকে পটুয়ারও এই ক্রমিক ধ্বংসের সূত্রপাত। গ্রামজীবনের যে-আবহমান কাঠামো পটুয়াকে একদা ধারণ করে রাখে, সেটাই ক্রমাগত ধসে যাচ্ছে। পালটে যাচ্ছে রুচি। চৌতিরিশ-পঁয়তিরিশ বছর আগে ইটাগুড়িয়ার সুদর্শন চিত্রকর বিনয় ঘোষকে বলেছিলেন, 'আগে বারোমাসে তের পার্বণের সঙ্গে ছোটো বড়ো অসংখ্য গ্রাম্য মেলা হত সব জায়গায়। এইসব গ্রাম্য মেলাতে আমরা নানারকমের দেবদেবীর পট এঁকে, কাঠের পুতুল গড়ে বিক্রি করতাম। মেলাতে-মেলাতে ঘুরে পট দেখিয়ে, গান গেয়ে যা রোজগার হত তাতেও স্বচ্ছন্দে আমাদের চলে যেত। এখন অধিকাংশ মেলা উঠে গেছে, যা দুচারটে আছে তাতে রবার-প্লাস্টিকের পুতুল আর সস্তা ছাপা ছবির এত আমদানি হয় যে আমাদের কাঠের পুতুল বা আঁকা পটের দিকে কেউ ফিরেও চায় না' ('পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি', ১৯৫৭, পৃ. ৭০০)। সেই রবার-প্লাস্টিকের পুতুল আর ছাপা ছবির পর, ক্রমশঃ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ল সিনেমা, রেডিও; এসে পড়ল টিভি, ভিডিও। নব্য বিনোদনের বিস্ফোরণ! তাই মেদিনীপুর জেলার নয়াগ্রামের শ্যামসুন্দর পটুয়া সম্প্রতি (২৪ জুন ১৯৯০) আনন্দবাজারের রিপোর্টারকে জানিয়েছেন, 'সিনেমা-টিভি-ভিডিওর বাজার এখন। পটে কি আর অতশত আনন্দ দেবার উপায় আছে?' পট লিখে আর পেট চলে না। তার ওপর আছে বাণিজ্যচণ্ডীর দাপট। পট এখন পণ্য। পট দেখানো নয়; পট বেচাই রোজগারের পথ। ক্রেতাও গ্রামের নয়; শহুরে মানুষ, বিদেশের মানুষ। তাই আজকাল পটুয়াদের 'মাসের মধ্যে চার-পাঁচবার দেখা যায় কলকাতা শহরে। হাতে পটভর্তি চটের ব্যাগ। বিভিন্ন অফিসে, বাড়িতে, পরিচিত জনের কাছে কয়েকটা পট বিক্রি করে সংসার খরচের টাকা নিয়ে গ্রামে ফিরে' যায় তারা। পরিস্থিতির এই বদলটুকু লক্ষ করে শিল্পী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'পোটোরা ব্যাগভর্তি পট নিয়ে শহরে আসছে এটা দশ বছর আগেও দেখা যায় নি। আমাদেরই গ্রামে গ্রামে ঘুরে পট দেখতে হয়েছে, পট সংগ্রহ করতে হয়েছে' ('আনন্দবাজার পত্রিকা', ২৪ জুন ১৯৯০)।

পটুয়াদের নিয়ে প্রথম নৃতাত্ত্বিক গবেষণা করেছেন বিনয় ভট্টাচার্য। তাঁরও বইয়ে ('কালচরাল অসিলেশন', ১৯৮০) ফুটে উঠেছে এই ক্রমিক ধ্বংসের ছবি। আয়তনের দিক দিয়ে এখন পটুয়া-কৌম বড়ো নয়, বরং ছোটোই। তাঁর আদমশুমার অনুযায়ী, বীরভূম জেলায় পটুয়াদের মোট সংখ্যা ১১৬৮; ৩৯টি গ্রামে ২৪৮ ঘর পটুয়ার বাস। সারা পশ্চিমবঙ্গে পটুয়াদের মোট জনসংখ্যা আনুমানিক ৫০০০। বীরভূমে তিন পুরুষের হিশেব নিয়ে

তিনি দেখেছেন : পটুয়ারা ক্রমাগত 'স্ববৃত্তি' ছেড়ে দিচ্ছে। ঠাকুরদার প্রজন্মে ৭২·৫১% পট লিখত ; বাপের প্রজন্মে ৬৮·৯১%। আর বর্তমান প্রজন্মের মাত্র ৫১·৫৯% নিজের বৃত্তি আঁকড়ে রয়েছে। এই পরিসংখ্যান বিনয় ভট্টাচার্য ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৬ সালের মধ্যে সংগ্রহ করেন।

পটুয়া-কৌম আজ ক্ষয়িষ্ণু। কিন্তু সংস্কৃতির ইতিহাসে দেখি : সমসময় যে-মানুষ গোষ্ঠীর নামে মৃত্যুপরোয়ানা পাঠিয়ে দিল, তারও কিছু দায়ভাগ অক্ষয় হয়ে থাকে মহাসময়ের ধারায়। সময়ের সঙ্গে এক-একটি কৌম-সংস্কৃতির সংঘর্ষের হয়তো এও একটা ধরণ ; অথবা পরিণাম।

তাহলে, প্রশ্ন ওঠে : পটুয়ার জীবনধারা, শিল্পধারা থেকে এই সময়ে বা ভবিষ্যতে কী নিতে পারে বাঙালির অন্য সংস্কৃতি ?

বিনয় ভট্টাচার্য দেখাচ্ছেন : পটুয়ার জীবনধারা পেণ্ডুলামের মতন দুলছে বড়ো বড়ো দুই প্রান্তবেণী সংস্কৃতির দুই মেরুবিন্দুকে ছুঁয়ে— হিন্দুর আর মুসলমানের। বড়ো বড়ো কালপর্ব জুড়ে দুই ভিন্ন মেরুর দিকে এই ক্রমান্বয় দোলন তো আছেই ; প্রতিদিনের জীবনধারাতেও রয়েছে এই দুই ভিন্ন সংস্কৃতির টানাপোড়েন। একদা বীরভূমের পানুরিয়া গ্রামের এক পটুয়া, ছবিলাল চিত্রকর, নিজেই যেমন বলেছিলেন গুরুসদয় দত্তকে : পটুয়ার 'রীত' মুসলমানের ; 'কর্ম' হিন্দুর। সে নমাজ পড়ে ; অথচ পট লেখে পুরাণের। ওর বিয়েশাদিতে কাজি আসে ; অথচ বিশ্বকর্মা পুজো করতে তার বাধে না। প্রত্যেক পটুয়ার দুটো নাম : একটা হিন্দু, অন্যটা মুসলমানি। যেমন : যার এক নাম সুদর্শন, তারই অন্য নাম সুকুরুদ্দিন। যে সুকুমার, সে-ই সুকুর। অথচ এই দুই বড়ো সংস্কৃতিতেই তার আগন্তুক-অস্তিত্ব। সে না-হিন্দু, না-মুসলমান।

অন্যভাবে বলা যায়, সে হল প্রান্তিক মানুষ। সমাজবিজ্ঞানে 'প্রান্তিক মানুষ' বলি তাকে, যে দুই ভিন্ন সংস্কৃতির বাসিন্দা। সেই সময়ে এই প্রান্তিক মানুষের উদ্ভব ঘটে, যখন দুই আলাদা সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব আর মিশ্রণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ইতিহাসে বার বার দেখতে পাই : এই প্রান্তিক মানুষের নেই গোঁড়ামির অন্ধতা ; তার মনের দিগন্ত আরও মুক্ত।

হিন্দু-মুসলমান কৌমের যে-বিকারকে আজ আমরা 'সাম্প্রদায়িকতা' বলি, বৈরিতার সেই দম-আটকানো পরিস্থিতিতে, পটুয়াদের ওই ছোটো কৌমের জীবনধারা হয়তো একটা মুক্তির পথ দেখিয়ে দেখিয়ে দেয়। এদিক দিয়ে আমাদের সংস্কৃতির ইতিহাসে তার ভূমিকা অংশতঃ কবির বা লালনের সঙ্গে তুলনীয়।

পটুয়ার বাঁচার ধরণে আরেকটা ব্যাপার আছে, যা গণ্ডিবাঁধা নয় ; খোলামেলা। ভাত-কাপড় জোগাড়ের জন্যে কোনও একটা বিশেষ বৃত্তিতে সে বন্ধ থাকে না। আগেই তো বলেছি, পটলেখার মতন জাতিগত বৃত্তি বরং আজ পড়ার দিকে। এখন যা বলতে

চাচ্ছি তা হল : জীবিকার বহুতর ক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ। যেমন : বীরভূমের বোনতা গ্রামের দ্বিজপদ চিত্রকর। তিনি পটও লেখেন, গোবৈদ্যগিরিও করেন, আবার তুকতাকও করেন। আসলে পটুয়া স্বভাবেও যাযাবর, বৃত্তিতেও যাযাবর। মূর্তিগড়া, চাষবাস, সাপুড়েগিরি, ওঝাগিরি, চাটাইবোনা, সানাবাঁধা, টোটকা-চিকিৎসা, মনিহারি সম্ভারের ফিরিওয়ালার কাজ—এইরকম বিচিত্র বৃত্তিতে তার আনাগোনা। বীরভূমে দক্ষ রাজমিস্ত্রি হিশেবে—চুনকাম, ডিসটেম্পারিঙের মিস্ত্রি হিশেবে— পটুয়ার খুব নামডাক।

শ্রমবিভাগ নামক ব্যবস্থাটায় দাসত্ব আর একঘেয়েমি আছে বৈকি। এতে কাজ থেকে কাজের আনন্দ হারিয়ে যায় ; বিচ্ছেদ তৈরি হয় শ্রমিকের সঙ্গে শ্রমজের। শ্রমিক যেন আর মানুষ থাকে না ; সে হয়ে ওঠে কলুর বলদ, মেশিনের গোলাম। শ্রমবিভাগের কল্যাণে আজকের সমাজব্যবস্থায় মেশিন পেয়ে যাচ্ছে শ্রমিক-নিরপেক্ষ এক স্বাধীন অস্তিত্ব ; বরং শ্রমিকই হয়ে পড়ছে ঐ মেশিনের শুধু এক সজীব অংশ। অটোম্যাটিক ফ্যাকটরির যে-মজুর এই শ্রমবিভাগের শিকার, তার দশার বিবরণ দিতে গিয়ে 'ডাস কাপিটাল'-এ কার্ল মার্ক্স স্মরণ করেছেন গ্রীক পুরাণের সেই সিসিফুস-এর উপাখ্যান। অন্তহীন একঘেয়ে খাটুনির এই-যে দুর্বিষহ রুটিন, যেখানে একই যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অবিরত পুনরাবৃত্তি চলতেই থাকে, সেটা সিসিফুসের অভিশপ্ত শ্রমের মতন। শ্রমের বোঝা ভারি পাথর হয়ে অবিরাম ঘুরে এসে পড়ে খিন্ন, জীর্ণ শ্রমিকের ঘাড়ে। শ্রমবিভাগের আরেকটা মারাত্মক দিক হচ্ছে : এই ব্যবস্থাতন্ত্র মানুষের আত্মপরিচয়কে টুকরো-টুকরো করে দেয়। মানুষের জীবিকাগত পরিচয়, যা তার আংশিক পরিচয় মাত্র, সেটাই গ্রাস করে তার পূর্ণ পরিচয়কে। শ্রমবিভাগের ঘূর্ণমান চক্রের ঘায়ে টুকরো-হয়ে-যাওয়া মানুষের এই-যে জগৎ, তারই একটা নিখুঁত ছাঁচ উঠে এসেছে রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকে। সেখানে মানুষ নেই : কেউ খোদাইকর কেউ অধ্যাপক, কেউ বা সর্দার। মানুষকে সেখানে শনাক্ত করা হয় সংখ্যা দিয়ে : কেউ সাতচল্লিশ ফ ; কেউ হয়তো ঊনসত্তর ঙ। পটুয়ার জীবনধারা শ্রমবিভাগের এই রুদ্ধ ইস্পাত-খুপরি থেকে মুক্ত। সে একাধারে পট-লিখিয়ে— রাজমিস্ত্রি আর চাষী তো হতেই পারে। আমাদের এই যক্ষপুরীর জগতে সে যেন বিশ্বপাগলের প্রতিরূপ ; যে একই সঙ্গে খোদাইকর ভাবুক আর গায়ক। ওই বিশ্বপাগলকেই নাটকের যক্ষপুরীতে নন্দিনী বলেছিল :

'তুমিই আমার প্রাকার। তোমার কাছে এসে উঁচুতে উঠে বাহিরকে দেখতে পাই।'

তিন

এবার প্রশ্নটির অন্য দিকটা নিয়ে আলোচনা করি : পটুয়ার শিল্পধারা থেকে এই সময়ে বা ভবিষ্যতে কী নিতে পারে আমাদের অন্য সংস্কৃতি ?

পটুয়ার শিল্পরীতি সম্পর্কে যামিনী রায় একবার খুবই দৃষ্টিমান মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, পটুয়ার ছবি যদিও ছবির আদিম ধারারই নিদর্শন, তবু অন্যান্য আদিম শিল্পধারার থেকে এক জায়গায় তার মস্ত তফাৎ। অন্য দেশের আদিম চিত্রকর নাচের ছন্দ এঁকেছে, মানুষ এঁকেছে, হরিণ এঁকেছে। কিন্তু এঁকেছে খাপছাড়াভাবে ; সব মিলে একটা জগৎ নয় এবং কোনও পুরাণে তার বিশ্বাস নেই। অন্য পক্ষে, বাঙলার প্রাচীন পটুয়া এমন একটা জগতের খোঁজ পায়, যা আগাগোড়া সামান্য লক্ষণের জগৎ, এবং একটি সংহত পুরাণের ওপর যার স্থিতি। সেখানে যে-জটায়ু সে তো মর্ত্যলোকের কোনও বিশেষ পাখি নয়, অথচ পাখির সামান্য লক্ষণ তার মধ্যে রয়েছে। পটের যে-হনুমান, সে তো জন্তু জগতের হনুমান নয়, অথচ তাকে হনুমান বলে চিনতেও ভুল হয় না। আর এই জটায়ু, এই হনুমান, এই রাবণরাক্ষস— এই সমস্তের মধ্যে আছে : একটি পুরাণের সংহতি। অর্থাৎ এক সংহত পুরাণ এল পটুয়ার অধিকারে, তার অস্তিত্বের শিকড়ে। সেকালের সেরা পটে জ্বলজ্বল করছে এই বিশ্বাস। এই সূত্রে যামিনী রায় বলেছিলেন, শিল্পের পক্ষে এই জাতের এক পৌরাণিক জগতে বিশ্বাস করবার অনিবার্য প্রয়োজন বার বার প্রমাণিত হয়েছে।

আমরা অনেকে ভুল করে ভাবি, পুরাণ বুঝি-বা এক নিঃসময়ের দেশ। আসলে পুরাণেও কাল আছে ; তবে সেটা পশ্চিমী অর্থে ইতিহাসের কাল নয়। পুরাণে নিহিত আছে সময়ের অন্য চলন, অনেক বড়ো ছাঁদ— এবং তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি জড়ানো আর্কিটাইপ্যাল ইমেজ, প্রত্নপ্রতিমা (মহাকালী, শিব ইত্যাদি) ; যা উঠে আসে এক-একটি কৌম-মনের গূঢ়তম পাতালস্তর থেকে। সময়ের এই বিশাল ছাঁদ, এই প্রত্নপ্রতিমা পটুয়ার ছবি-আর-গানের অন্তর্বিষয়। সমাজের নীচের তলার এই আদিম শিল্পধারা থেকে তার ওই অন্তর্বিষয় কীভাবে উঁচুতলার সংস্কৃতিতে চারিয়ে যায়, তা বুঝে নেবার জন্যে একটি পটুয়া-গান আর তারাশংকরের একটি ছোটোগল্পকে এখন পাশাপাশি রাখব।

যে-পটুয়া গানটি বেছে নিচ্ছি তার নাম 'চাষপালা' আর তারাশংকরের গল্পটির নাম 'পৌষ-লক্ষ্মী' ('যুগান্তর', শারদীয় সংখ্যা, ১৩৫১)।

গুরুসদয় দত্ত -সংকলিত 'পটুয়া সঙ্গীত'-এর ১০২-১০৭ পৃষ্ঠায় গানটি পাওয়া যাবে। তারাশংকরের দেশ লাভপুর ; সেই থানারই অন্তর্গত দাঁড়কা গ্রামের গুণমণি চিত্রকরের কাছ থেকে এই পটুয়া গানটি পেয়েছিলেন গুরুসদয়। 'চাষপালা'র বিষয় : শিবের চাষ। শিবমঙ্গল বা শিবায়নেও লৌকিক পুরাণের এই গল্পটি পাই। চাষী সমাজে গাজনের সময় এই শিবের গীত গাওয়ার রেওয়াজ আছে। হর-গৌরীর মহিমাকীর্তন 'চাষপালা'র লক্ষ্য হলেও এ পুরাণের কৃষিকাজ-ঘটিত কর্মকাণ্ডের প্রকৃত নায়ক কিন্তু ভীম। সে এই লোকপুরাণে দুর্ধর্ষ আদিম চাষীর প্রত্নপ্রতিমা।

পটুয়ার ভুবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল তারাশংকরের। আর চাষপালার এই লোকপুরাণটি যে তিনি বিলক্ষণ জানতেন তার প্রত্যক্ষ প্রমাণও পেয়ে যাচ্ছি ওঁর সাংবাদিক রচনায়। দৈনিক 'যুগান্তর'-এ 'গ্রামের চিঠি' নামে একটি নিয়মিত কলম

লিখতেন তিনি। ১৯৬৮ সালের ১৫ এপ্রিলের 'গ্রামের চিঠি'-তে উনি শিবের ভিখারি থেকে চাষীতে রূপান্তরের গল্পটি বলেন। সে প্রসঙ্গে লোকপুরাণের ওই কৃষক-ভীমের কথাও লেখেন তিনি।

গুরুসদয়ের 'পটুয়া সঙ্গীত' এখন দুষ্প্রাপ্য। বইখানি ছেপেছিলেন কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়; কিন্তু ওঁদের লাইব্রেরির থেকেও এখন বইখানি বেবাক উধাও হয়ে গেছে! এই কারণে 'চাষপালা'র গল্পটি একটু ছড়িয়ে বলছি।

একদিন শিব দুর্গাকে বলল :

'দেহতে সুখ নাই গৌরী ভিক্ষাতে না যাব
তোমা হতে অন্ন আজ ঘরে বসে খাব।'

দুর্গা তো পড়ল আকাশ থেকে! পয়লা পাতে দেব কী? ঘরে যে একমুঠোও চাল নেই! ক্রুদ্ধ শিব তখন জানতে চায় :

'কাল ভিক্ষা করিলাম দুর্গা কুচীন নগরে
কি বুঝে বল গৌরী অন্ন নাইকো ঘরে।'

দুর্গা জবাব দেয় :

'হাতে খড়ি নাও না ঠাকুর নাও না কেন লেখা
উচিত কথা বলতে গেলে মুখ করো না বেঁকা।'

তুমি তো কাল ভিক্ষা করে এনেছিলে ছ পশুরি চাল। ধন-কুবিরের [কুবের] কাছে দেনা ছিল বহুকালের। পাঁচ পশুরি দিয়ে তার লেঠা চুকালাম। ভাত রাঁধলাম পশুরিখানেক চাল দিয়ে। তোমরা তিন বাপবেটায় তো সে ভাত খেলে; তোমাদের পাতে সব ভাতটুকু বেড়ে দিয়ে আমি রইলাম উপোসি।

শিব বলে, চালের হিশেবনিকেশ তো পেলাম। কিন্তু কালকের ভিক্ষের ধান কোথায় গেল?

দুর্গা জবাব দেয়, গোঁসাই, তিন পো ধান তো সবশুদ্ধু এনেছিলে তুমি। পোখানেকের চিঁড়ে-সন্দেশ খেয়েছে তোমার ছেলে। পোখানেকের ধান দিয়ে তোমার সিদ্ধির চাট, নকুল ভাজা, হল। বাকি পোখানেক ধান মেঝেতে পড়ে যায়। তা দিয়ে কার্তিক গণেশের দুই বাহন— ময়ূর আর ইঁদুর — জলপান করেছে।

শিব জানতে চায়, কাল যে ভিক্ষায় বড়ি পেয়েছিলাম সেটা কোথায় গেল?

দুর্গা বলে :

'হেই গো মাতা হেই গো পিতা এই কি নাজের কথা
ইন্দুরে খেয়েছে বড়ি কতই দেবো লেখা।'

ওই কথা শুনে খ্যাপা শিব ইঁদুর মারতে যায়। ইঁদুর তখন লুটিয়ে লুটিয়ে শিবের পা ধরে। আর দুর্গা বলে :

'…মেরো না মেরো না ইন্দুর গণেশেরি ঘোড়া

যার ঘরে ইন্দুর নাই সে যে লক্ষ্মীছাড়া।'

তারপর, কাঁখে কার্তিককে নিয়ে আর লম্বোদরের হাত ধরে দুর্গা চালের খোঁজে গেল ধন-কুবেরের ঘর। কুবির ধুরন্ধর মহাজন! সে খাতককে ল্যাজে খেলায়। দুর্গাকে দূর থেকে দেখেই সে একমুঠো ধান উঠানে ছড়িয়ে দিয়ে আটকাঠি দিয়ে এক-এক কণা ধান কুড়াতে শুরু করে। তারপর দুর্গাকে ডেকে হাঁক দিয়ে বলে, কোথায় যাও, দুর্গা? এসো দেখি। কথা কও।

দুর্গা বলে, আজ শিব ভিক্ষায় যায় নি। পণ্ডরিখানেক চাল দাও তুমি, তাহলে উপোস রক্ষা হয়।

কুবির চাল না দিয়ে কথা শোনায় :

'লেবার সময় লাও দুর্গা খাবার সময় খাও
শুধবার বেলা হলে কুন্দলী পাকাও।'

ক্ষুণ্ণ দুর্গা কৈলাসে ফিরে যায়। শিবকে মিনতি করে :

'...ভিক্ষার মায়া ছাড় ঠাকুর চাষে দাও গো মন
চাষ যে দুর্লভ জিনিস এ তিন ভুবন।
ভুঁইএ লাগাও মুগ-মুশুরী পগারে লাগাও কলা
নৈবেদ্য বাড়াবে ঠাকুর ধর্ম্ম-সেবার বেলা।...
চাষ·· কর মহাদেব সুখে অন্ন খাবে
বড় বড় মণিলাগ দুয়ারে বসে পাবে।'

শিব চাষে নারাজ। সে নানান ওজর তোলে :

'কোথা পাব হাল জোয়ান লাঙ্গলের ইসে
চাষের সামগ্রী লইলে চাষ করিব কিসে।
চাষ চাষ করে দুর্গা না কর জঞ্জাল
কোথায় পাব হাল বলদ কোথায় পাব ফাল।'

নাছোড়বান্দা গৌরী উত্তর দেয় :

'হাতের ত্রিশূল ভাঙ্গ ঠাকুর গড়াও কোদাল-ফাল
আমার বাঘ তোমার বসোয়া মর্ত্তে জোড় হাল।

শিব শেষ ওজর দেখায় :

'...হাল যদি জুড়ব দুর্গা বীচন পাব কতি?'

দুর্গা তখন বীচন আনার জন্যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে পাঠায় ভীমকে। লক্ষ্মীর কাছে হাজির হয়ে ভীম আর্জি জানায় :

'চাষ-কর্ষণ করবে তোমার ভোলা মহেশ্বর
বীচনের কারণে পাঠাইলে তোমারি নগর।

লক্ষ্মী বলে, অন্য লোককে ধার দিলে সে তো সুদ শুদ্ধ ফেরত পাই আমি। কিন্তু

মহেশ্বরকে ধান দিলে মূলে চুলে যায়। ভীম, তুই যদি বীচন নিবি, তাহলে জামিন ঠাওর কর।

সমস্ত পৃথিবী তন্ন তন্ন খুঁজে ভীম কোনও জামিন না পেয়ে, শেষ অবধি চন্দ্র সূর্য দুই ভাইকে ডেকে আনে।

লক্ষ্মী বলে, চন্দ্র সূর্য দুই ভাই তোমরা সাক্ষী থেকো। আমি শামুকখানেক বীচন ভীমকে দিচ্ছি। খেতে ধান হলে, ভীম দু শামুক ধান আমায় দিয়ে যাবে। আর, ভীম, তুমি যদি বীচন নেবে, তাহলে আমার এখানে ভাত খেয়ে যেয়ো।

পেটুক ভীম তো মহাখুশি!

'ওই কথা শুনে ভীম কুদিয়ে বসিল।
নখের টংকারে ভাঙ্গে লোহার পঞ্চবেল
সইসে নিচুড়ে সেদিন গায়ে মাথে তেল।
বাহান্ন পৌটি চাল খেতে বাহান্ন পৌটি ডাল
শত হাঁড়া ঘৃত দিলে নব মণ চাল।'

ভীম গদা দিয়ে উনুন বানায়। মাড় গালে হাঁড়ার কানা ধরে। ষোল ক্রোশ জুড়ে কলার আঙ্গোট পেতে তার ওপর বাড়ে 'পর্ব্বতপ্রমাণ অন্ন'। গরম ভাতে ঘি আর নুন ছিটিয়ে আড়াই গ্রাসে ভীম সবটুকু খায়। আর চুষে চুষে খায় চৌষট্টি পণ আম। লক্ষ্মী এসে শুধায়, বাবা, ভাতে তোমার কুলিয়েছে তো? ভীম বলে, মা, পেট পুরো ভরে নি; মাত্র সিকিভাগ ভরেছে!

ভীম বীচন বেঁধে ফিরে যায় কৈলাসে। বাঘ আর বলদের কাঁধে হাল জুড়ে চাষ শুরু করে ভীম। 'চাষপালা' শেষ হয় এইভাবে:

'এক চাষ দু' চাষ ভীম তিন চাষ করিল
তিন চাষ করে সেদিন বীচন ছড়াইল।
জয় হরি শ্রীহরি বলে মই জুড়ে দিল
পুর্ব্বেতে জুড়িয়া মই পশ্চিমে তুলিল।'...

তারাশংকরের 'পৌষ-লক্ষ্মী' গল্পটির শিখরে আছে মাঠ থেকে খামারে ধান তুলে আনার সময়ে এক সদ্‌গোপ চাষী— মুকুন্দ পাল-এর— মৃত্যু। মুকুন্দ রাঢ়ের সাবেক কালের সেরা চাষীর টাইপ। এই পরাক্রান্ত চাষীর মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তারাশংকর যা ফুটিয়ে তুলছেন সেটা তাঁর গল্প-উপন্যাসের মূল থীম: গ্রামসমাজের ভাঙন। এই বিষয়টির সঙ্গে তারাশংকর একাত্ম হয়ে উঠেছিলেন তাঁর সৃষ্টির সবচেয়ে ফলন্ত ঋতুতে। 'পৌষ-লক্ষ্মী'র পটভূমিতে কালো ছায়ার মতন থমথম করছে পঞ্চাশের মন্বন্তর আর তৎকালীন ম্যালেরিয়া মহামারী। ইতিহাসের বা ক্যালেন্ডারের যে-কালে গল্পটি বাঁধা, সেইটে খুবই নির্দিষ্ট: বাঙলা সন ১৩৫০-এর পৌষ মাস। হয়তো বা প্রকৃতির আর ইতিহাসের পরিহাস! মন্বন্তরের ঠিক পরে, সেই পৌষেই, ধানের অঢেল ফলন হয়

রাঢ় অঞ্চলে। মন্বন্তর-মহামারী আর 'মাঠ-থইথই-করা ধান', শবযাত্রার হরিবোল আর পৌষ-লক্ষ্মীর আবাহন— এই দুই কালো আর শাদা সুতোয় গল্পটিকে বুনেছেন তারাশংকর।

ওপর-ওপর দেখলে মনে হয়, কী-ই বা মিল? 'চাষপালা' আর 'পৌষ-লক্ষ্মী' তো একেবারেই আলাদা গল্প : প্রথমটি বীজ-বোনার গল্প, পরেরটি ফসল-তোলার। কিন্তু তলিয়ে দেখলে, ধীরে ধীরে বুঝতে পারি, গভীর স্তরে, কত-যে সমান্তরতা আছে এই দুই গল্পে।

স্বভাবতঃই 'চাষপালা'য় লোকপুরাণের ওই গল্পটিকে বলা হচ্ছে গোটা কৌমের দৃষ্টিবিন্দু থেকে। 'পৌষ-লক্ষ্মী'-তে পাচ্ছি দৃষ্টিবলয়ের তিনটি সম্পৃক্ত স্তর। একটি স্তরে, ঘটনার স্রোতকে দেখা হচ্ছে গল্পের প্রোটাগনিস্ট মুকুন্দ পালের চোখ দিয়ে। আরেক স্তরে, সেটা দেখছে লেখকের চোখ। আর, গল্পের সবচেয়ে গূঢ় স্তরে এসে যুক্ত হচ্ছে ছোটোগল্পের পক্ষে নতুন এক দৃষ্টিবিন্দু : সমগ্র কৌমের দৃষ্টিবিন্দু,— পটুয়া-গানের মতন। যে-কারণে মুকুন্দ পালের মৃত্যুতে গল্প থামে না; তারপরেও আরও খানিক দূর এগোয় এইভাবে :

'সংক্রান্তির শেষ-রাত্রে পালের বাড়িতে পৌষ আগলাতে উঠে সরস্বতী, লক্ষ্মী শুধু কাঁদলে। কাঁদতে কাঁদতেই কোন রকমে পৌষ পুজোর ছড়া বললে। শাঁখটা বাজাতে গিয়ে বাজাতেই পারলে না।

যোগেন্দ্র উঠে বসেছিল ঘরে চুপ করে। রমণ মরেছে, মুকুন্দ মরেছে, এইবার— ! সে দড়াম করে খোলা জানালাটা বন্ধ করে দিলে।'

এই শেষ অংশে তো বটেই, গোটা গল্প জুড়ে এক কৃষক প্রজন্মের মৃত্যুকে দেখছে কৌমের সহস্র চোখ। গল্পের স্রোতে নিঃসৃত শব্দগুলির আবর্তের মধ্যে থেকে শুনতে পাওয়া যায় সমস্ত গ্রামসমাজের দীর্ঘশ্বাস।

এমনকি ভাষাগত স্তরেও, 'পৌষ-লক্ষ্মী'র জায়গায় জায়গায় 'চাষপালা'র অনুরণন শোনা যায়। 'চাষপালা'য় পাচ্ছি, লক্ষ্মী ভীমকে খেতে দিল :

'বাহান্ন পৌটি চাল খেতে বাহান্ন পৌটি ডাল'

আর, তারাশংকর বাগদি-কাহার-মুচি ইত্যাদি গ্রাম্য দিনমজুরের প্রসঙ্গে লিখছেন, তারা প্রতি বছরই বর্ষার সময়, বিশেষ করে অজন্মার বছরে, দল বেঁধে গাঁ ছেড়ে চলে যায়। আবার তারা দল বেঁধে ফেরে :

'এমনই ধারা বাহান্ন পউটির বছরে, ধানে ধানে ছয়লাপের পোষে।'

এই 'বাহান্ন পউটি' উঠে আসছে 'চাষপালা'র জগৎ থেকে। সিউড়ির শিবরতন মিত্রের সাহায্য নিয়ে গুরুসদয় 'পৌটি'র মানে লিখেছেন : '১৬ বিশ পরিমাণ'। হরিচরণ-এর অভিধান অনুযায়ী : এক শো ষাট মনে এক পউটি। তবে, তারাশংকর এখানে 'পউটি'র অর্থবিস্তার ঘটাচ্ছেন। তাঁর প্রয়োগে শব্দটি নিরূপিত পরিমাপ বোঝাচ্ছে

না ; ব্যঞ্জনা দিচ্ছে অপরিমিত প্রাচুর্যের।

কাঠামোর স্তরে এই দুই গল্পের মিল আছে নানান দিকে। যেমন : লক্ষ্মীর একটা প্রধান ভূমিকা রয়েছে দুটো আখ্যানেই। 'চাষপালা'য় ভীমকে বীচনও জোগায়, ভাতও দেয় লক্ষ্মী। আর তারাশংকরের আখ্যানে তো পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে পৌষলক্ষ্মীর অধিষ্ঠান। পৌষলক্ষ্মীর ব্রতপার্বণ আর পৌষ আগলানোর অনুষ্ঠান রাঢ়ভূমির কৌম-সংস্কৃতির মস্ত বড়ো বৈশিষ্ট্য। সেই ব্রতকথা আর অনুষ্ঠানের দীর্ঘস্মৃতিময় অজস্র অনুষঙ্গ দিয়ে গল্পটিকে পরতে পরতে ভরে দিয়েছেন তারাশংকর।

মহাজনের চরিত্র, দুটো গল্পেই প্রবলভাবে উপস্থিত। 'চাষপালা'য় ধন-কুবির হচ্ছে দেবলোকের মহাজন। দয়ামায়ার বালাই নেই তার মনে। অন্নপ্রার্থী অন্নপূর্ণাকে হেনস্থা করার ফিকিরে উঠানে ধান ছড়িয়ে সেই ধান সে আবার একটা-একটা করে আটকাঠি দিয়ে তুলতে থাকে। কায়দাটা সুকুমার রায়ের সেই খুড়োর কলের পৌরাণিক সংস্করণ ! চাল তো দেয়ই না ; উলটে দুর্গার মর্মমূলে বিষাক্ত কথার হুল ফোটায়। 'পৌষ-লক্ষ্মী' গল্পের লৌকিক জগতে এই ধন-কুবিরের প্রতিরূপ হল : শ্রীকৃষ্ণ পাল, ওরফে চেকা। সে 'এখন গ্রামের মধ্যে সকলের চেয়ে অবস্থাপন্ন চাষী'। মহাজন তো বটেই। ' "মহামহিম শ্রীশ্রীকৃষ্ণ পাল বরাবরেষু" বয়ানে লেখা এ গাঁয়ের লোকের সই-করা খত আছে ওর ঘরে।' চেকা আসলে রায়ত-খাদক রায়ত : মন্বন্তরের দুঃসময়ে অভাবী চাষীর জমি সে গ্রাস করে নেয়। কুবিরের মতো তার কথাও 'তপ্ত লোহার শলার' মতো। সে-ও বারবার হেনস্থা করে মুকুন্দকে, সম্পূর্ণ অনর্থক। 'পৌষ-লক্ষ্মী'তে এই শ্রীকৃষ্ণ পালই মুকুন্দের প্রতিপক্ষ। আখ্যানের ছন্দ টানটান হয়ে ওঠে এই দুজনের সংঘাতে। প্রসঙ্গতঃ বলি— চাষীমহাজন থেকে ধাপে ধাপে জোতদার হয়ে-ওঠা বাস্তবের যে-মানুষটি 'গণদেবতা'য় ছিরু পালের আদিরূপ, তারও প্রকৃত নাম : শ্রীকৃষ্ণ পাল। 'পৌষ-লক্ষ্মী'তে আরেক অবয়ব নিয়ে সেই চরিত্রটিই ফের ঘুরে যায় তার পৈতৃক নাম সমেত !

যে-সমান্তরতা সবচেয়ে তীক্ষ্ম রেখায় আঁকা তা ভীমের সঙ্গে মুকুন্দর। তারাশংকর অনেক অনুপুঙ্খ দিয়ে এই প্রতিসাম্য তৈরি করেছেন তিলে তিলে। মুকুন্দ যেন সত্যিই লোকপুরাণের দেশ থেকে নেমে-আসা ভীম, সেই আদি চাষী :

'পাল তার হাতখানা মেলে ধরলে চোখের সামনে ; এ হাতের গ্রাসে, লোকে বলে, একপো চালের ভাত উঠে।···তার হাতখানা প্রকাণ্ড। এই হাতের এক মুঠায় সে খপখপ করে ধরত ধানের গোড়া আর ডান হাতের কাস্তের এক টানে কেটে চলত ঘাস-কাটার মত ; তার এই মুঠার তিন মুঠা ধানে বাঁধা ধানের আঁটি অন্য লোকের বাঁধা আঁটির দ্বিগুণ না হোক, দেড়া মোটা হত। বেলা এক প্রহর যেতে না যেতে, রোদের আঁচে ধানগাছ শুকিয়ে খড়খড়ে হবার আগেই ক্ষেতের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত শেষ করে ফেলত।'

'ওরে বাসরে ! এ যে ভীমের মত ধান কাটতে লাগছে।' ঠিক এ-কথাটা মুকুন্দকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দুজন বলে, দুবার : একবার বৌ, আরেকবার নাতনি।

লোকমানসে ভীম মহাবলী মল্লযোদ্ধা। মুকুন্দও দোর্দণ্ড মল্লবীর। অম্বুবাচীর লড়াইয়ের আখড়ায় তার সঙ্গে আর কারোরই এঁটে ওঠার জো নেই।

'চাষপালা'য় আছে চাষ শুরুর আগে ভীম 'সইসে নিচুড়ে সেঁদিন গায়ে মাখে তেল।' 'পৌষ-লক্ষ্মী'তেও পেয়ে যাচ্ছি ধানকাটার আগে মুকুন্দর তেল-মাখার সরস বিবরণ।

টেকনিক হিশেবে, ভীমের সঙ্গে মুকুন্দর এই উপমাকে তারাশংকর এ গল্পে পাঁচবার পুনরাবৃত্তি করেন ঘুরে ঘুরে, গানের ধুয়োর মতন। এ প্রক্রিয়ায় আদিকৃষক ভীমের এই প্রতিমাটি ধীরে ধীরে অর্জন করে প্রতীকের তাৎপর্য। বিশেষতঃ পঞ্চম বা শেষ প্রতিমাটি অবিস্মরণীয় ছাপ রেখে যায় :

'গাড়ি চলছিল। পালের দুই হাতের মুঠোর মধ্যে ছিঁড়ে এল মুঠো-ভর্তি ধান। গাড়ি চলে গেল। পাল মাটিতে পড়ে গেল মহাপ্রস্থানের পথে ভীমের মত।'

তিনটি স্তর আছে মুকুন্দর চরিত্র-কাঠামোয়। এক স্তরে, ওর চরিত্রে তারাশংকর, রিয়ালিস্ট রীতিতে, ছোটো ছোটো রেখায় পরিস্ফুট করছেন ব্যক্তিস্বরূপ-চিহ্নিত নায়কের আলেখ্য। অন্য স্তরে— পটুয়ার রীতিতে— ঐ চরিত্রে তিনি ফুটিয়ে তুলছেন চাষীর সামান্য লক্ষণ। আবার, আরেক স্তরে, ওকে আঁকছেন লোকপৌরাণিক ভীমের আদলে। এই তিনটি পৃথক স্তর এই চরিত্রপটে জুড়ে গেছে, বেমালুম।

দেখলুম : লক্ষ্মী-ধনকুবির-ভীম সমেত 'চাষপালা'র সেই সংবন্ধ পুরাণ ফিরে এসেছে তারাশংকরের গল্পে। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক : এই পটুয়া-পুরাণকে 'পৌষ-লক্ষ্মী'র অস্থি আর মজ্জার ভিতরে কেন মিশিয়ে নিচ্ছেন তারাশংকর? কেন উনি কৃষক-ভীমের ওই প্রস্তরপ্রতিমার আশ্রয় নিচ্ছেন? মনে হয়, এর মূলে আছে মন্বন্তরের সেই ছিন্নভিন্ন সময়ের অভিজ্ঞতাকে শিল্পের স্থির বিন্যাসে বাঁধবার মরিয়া আকুতি, প্রয়োজন। পটুয়া-গানের ওই পুরাণ তাঁর হাতে জুগিয়ে দিল মহাসময়ের আয়তনে দুর্বোধ্য সমসময়কে বোঝবার, ধরবার, একটি ফ্রেম।*

* এ লেখার প্রথম পাঠ বেরোয় 'কলকাতা' পত্রিকায় ১৯৭০ সালের জুন মাসে। বর্তমান পাঠে লেখাটি বেড়ে গেল, প্রায় চার গুণ।